"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৫ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রিত সংখ্যা : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জাল সংখ্যা : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৬১তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১০ই বৈশাখ, ১৪৩২ / 24.04.2025

:- সম্পাদক -:

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

(৬১তম মাসিক অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
শ্রী অরবিন্দের বাণী	শ্রী অরবিন্দ
স্বাধীন তুমি	শ্রীমা
পার্থসারথি	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ
বিজ্ঞানের সত্য এবং সাহিত্যের সত্য	শ্রী দিব্যজ্যোতি রাহা
তারকনাথের তারকেশ্বর	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
প্রতিবাদ	সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

DO NOT COPY

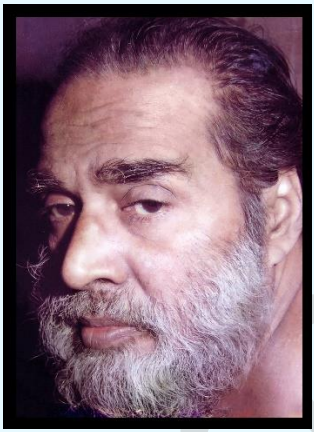

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো ধর্ম, সেবা ও ত্যাগ। সেবা হবে প্রেম ও শ্রদ্ধার সাথে। ধর্ম-জীবন ও সেবা – এই দুটি দিয়ে গড়ে তুলতে হবে প্রথমে নিজের জীবন, তারপর নিজ নিজ সংসার, গোষ্ঠী ও সমাজ, দেশ। নিজের জীবনকে প্রথমে পবিত্র ও শুদ্ধ সেই সঙ্গে প্রেমময় করে তুলতে হবে।"

DO NOT COPY

গতবার আমার কুম্ভমেলার সামান্যতম বর্ণনা লেখা হয়েছে। এবার আসি আমার অপারেশান পর্বে। ট্রেন থেকেই অসুস্থ। মোটামুটি একটি রাত্রে কোনও ভাবেই চোখের পাতা বন্ধ করতে পারিনি। তারপর আরও একটি রাতও ঐভাবেই কেটেছিল। বাড়ী ফেরবার পর ভাবলাম রেহাই পেলাম। কিন্তু প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও বমি করবার পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই গীতাদি ও ডাক্তারবাবুকে দৌড়ে আসতে হল। দেখা মাত্রই ঘোষণা করলেন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। ওষুধ দিলেন। অপারেশনের কথা কিছু বলেন নি। এমনিতেই ডাক্তারবাবু খুব কম কথা বলেন। হয়তো শ্রীপ্রীতিকুমারের অনুপস্থিতির কথা চিন্তা করে অপারেশনের উপর জোর দিলেন না।

আমার সেই বেয়াল্লিশ বছরের বন্ধু অনিমা? আমাকে দেখেই বললো, "তুই ডঃ অজিত নানকে দেখা। অ্যাপেণ্ডিক্স বার্স্ট করলে তোর পেটে গ্যাংগ্রীন হয়ে যাবে।" বিগত দু'বছরের মতো একবারও বললো না – "দাদা নেই, তোর পেট আর কাটতে হবে না।" আমাকে নিয়ে গেল ডঃ নানের কাছে। এক সেকেণ্ডের মধ্যে বলে দিলেন, "Immediate Operation -- ." অনিমা বললো, "আমি থাকবো, তোর ভয় কি?" ভয়টা কি তাতো জানো না! ভয় হচ্ছে Saline, Dextrose, Drip দেওয়া, ভয় হচ্ছে নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে দেওয়া, ভয় হচ্ছে হাত পা বেঁধে রেখে দেওয়া। গতবারের অপারেশনে আমি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। সেবার শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে রক্ষা করেছিলেন, সমস্ত সময় নিজে উপস্থিত ছিলেন। অপারেশনের আগের দিন বাড়ীতে পালিয়ে এসেছিলাম হসপিটাল থেকে। বলেছিলাম, "আমার নাকে টিউব দেবে, আমি সহ্য করতে পারবো না।" Ryle's Tube-এ আমার ভীষণ ভয়। উনি পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, "না, না, টিউব লাগবে না। আমি আছি, ভয় কি?" অপারেশনের আগের দিন অনেক রাতে অনিমার বাড়ীতে চলে গেছিলেন। বলেছিলেন, "অনিমা, তুমি কাল সকাল থেকে আর জি কর-এ থেকো।" অনিমা সেকথা শুনেছিলো। সেবার আমার জ্ঞান ফেরার আগেই অনিমাকে বলেছিলেন, "ওর

জ্ঞান ফিরে আসছে। শীঘ্র টিউবটা নাক থেকে খুলে দাও।" এবার আর সেকথা বলবার কেউ ছিলো না। একটা শনিবার সকালে বাপীর সাথে আর জি কর-এ গেলাম। তখনই এডমিশন। আমি তখনও জানিনা যে ঐ দিনই অপারেশান হবে। বাপী আমাকে বেড-এ দিয়ে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি সিস্টার একটি বিরাট লিস্ট আমাকে দিয়ে বললেন, "এই ওষুধগুলি আনিয়ে নিন। আজকেই আপনার অপারেশান হবে। জল খাবেন না।" হঠাৎ কিরকম কান্না পেলো। মনে হল আমার কেউ নেই। এবার এরা নির্ঘাৎ আমাকে মেরে ফেলবে। লিস্টটা নিয়ে একলাফে সেপটিক ওয়ার্ড-এ অনিমার কাছে। ভয়ে দু' ঢোঁক জল খেয়ে ফেললাম। অনিমাকে বললাম, "বাপীকে ফোন কর। বাপী না এলে আমি অপারেশান করবো না।" অনিমা শম্ভুকে ফিট করে দিলো বাড়ীতে ফোন করবার জন্য। শেষ পর্যন্ত ও বাপীকে লাইন-এ পেলো। ইতিমধ্যে অপারেশান থিয়েটার থেকে R.S. চলে এসেছেন – কেন O.T.-তে পেশেন্ট পাঠানো হচ্ছে না। এদিকে বেলা দু'টোর পর যে নার্সের ডিউটি, তিনি আসেন নি। হয়তো সেদিন (শনিবার) T.V.-তে ভালো সিনেমা ছিলো। অনিমা ওর ওয়ার্ডের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমার কাছে এলো। R.S. নিজে দু'বার এসে ওকে তাগাদা দিলেন শীঘ্র O.T.-তে পেশেন্ট পাঠাবার জন্য। আমার ছিলো এক নম্বর। আগেরবার শুনাছিলাম অপারেশান শেষ হতে চার ঘণ্টা লেগেছিলো এবং বাকী যে তিন জনকে পেথিডিন/ মরফিয়া ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছিলো, তাদের অপারেশান না করেই বেড-এ ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল। আরতিদি (ডঃ আরতি রায়) অনিমাকে বলেছিলেন, এমন একটা গাড্ডা কেস কোথায় পেলে? সে যাত্রা বেঁচে গেছিলাম। হসপিটাল-এ সেবার উপস্থিত ছিলেন শ্রীপ্রীতিকুমার, মিঃ দত্ত, মিঃ নন্দী, কে সি মুখার্জী, পারিজাতদা, নীরেনদা, মিঃ মজুমদার ইত্যাদি ইত্যাদি। গীতাদি তখন বিহারে থাকতো। তাই এবার গীতাদি সেই ডিউটিটা করলো।

R.S.–এর ক্রমাগত তাগাদায় অনিমা সার্জিকাল ওয়ার্ড-এ কোনও সিস্টার না দেখে, দৌড়ে ওর নিজের ওয়ার্ড থেকে একটি এপ্রন ও দুটি চাদর নিয়ে এলো।

কিছুক্ষণ পরে ইউনিফর্ম পরা একজন সিস্টারকে ড্রেস করবার জন্য ধরে নিয়ে এলো। ওঃ!! অপারেশানের আগে ড্রেস করবার অভিজ্ঞতা যার না আছে তিনি একটি ভয়ঙ্কর জিনিস মিস করবেন। আধখানা ব্লেড নিয়ে সে গলার থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত টানতে আরম্ভ করে। রোগী নড়লে তাকে যা বকাবকি করা হয়, তাতে কানে তুলো দিয়ে থাকাই ভালো। তারপর কাজ শেষ করে যখন স্পিরিট মাখানো তুলো দিয়ে ড্রেস মোছা হয় তখন জ্বালাতে রোগীর বাবারে, মা'রে করবার মতো অবস্থা। যাইহোক আমার সে পর্ব সমাধা হল। অনিমাকে সে কথা বলাতে ও বলে উঠলো, "এই জন্য আমার ওয়ার্ড-এ অপারেশান-এর পর রুগী এলে দেখি রুগীর দাড়ি গজিয়ে গেছে!"

অনিমা আমার কোমরে একটি, দু'হাতে দু'টি ইঞ্জেকশন নিজেই দিয়ে দিলো। ওর ইঞ্জেকশন এর হাত এতো ভালো, চিন্তা করা যায় না। তারপর নিজের ওয়ার্ড-এর শম্ভুকে ডেকে নিয়ে এলো। সার্জিকাল থেকে আরেকজনকে ট্রলি ঠেলতে পাওয়া গেলো। 'Body' চললো সার্জিকাল ওয়ার্ড-এর তিন তলা থেকে নতুন বিল্ডিং (এমারজেন্সি)-এর O.T.-তে। ঐ তিনটে ইঞ্জেকশন-এও আমার ঘুম পায় নি। কিন্তু ট্রলিতে শুয়ে শুয়ে অনুভব করলাম স্নো হোয়াইটের সৌন্দর্য নষ্ট করবার জন্য তার সৎ মায়ের দেওয়া বিষ মাখানো আপেলের টুকরো কেমন করে উঁচু নীচু রাস্তায় স্নো হোয়াইটের পেট থেকে বেরিয়ে গেছিলো। ভাগ্যিস আমার পেটে সারাদিন কিছু পড়েনি। এমার্জেন্সি বিল্ডিং-এ পৌঁছাবার সময় দেখছিলাম কোথাও পুত্রের মোটর সাইকেল আছে কিনা। বিল্ডিং-এর কাছাকাছি পৌঁছে মাথা তুলে দেখতে লাগলাম মোটর সাইকেলগুলি সার সার রাখা আছে। চোখে চশমা ছিল না। তবু সবচেয়ে ধুলোমাখা লাল মতো মোটর সাইকেলটি পুত্তরের মনে হল। হঠাৎ অনিমা চেঁচিয়ে উঠলো- "ঐ তো বাপী।" প্রাণে জল এলো। দু চোখে অঝোরে জল। আর আমি বাঁচবো না। বাপী দৌড়তে দৌড়তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে O.T.-র দরজা এসে গেলো। বাপীর আর আগে যাওয়া চলবে না। হঠাৎ আমার মনে হলো শ্রীপ্রীতিকুমার দাঁড়িয়ে আছেন। আমি শুয়ে শুয়ে হাত জোড় করে প্রণাম

জানালাম। পরে জ্ঞান ফিরলে মনে হয়েছে- সর্বনাশ করেছি। ছেলে মনে করবে বিপদে পড়ে ওকে নমস্কার করছি। কি হবে? অনিমাও আমার সাথে O.T.-তে ঢুকলো। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। আমাকে একটা ওয়েটিং রুমে রাখা হল। মাথার কাছে আর একজন রুগী। হঠাৎ সে পা-টা সোজা করাতে আমার মাথায় লাগা মাত্র আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, "এ্যাই! লাথি মারা হচ্ছে?" সে সাড়া দিলো না। ধীরে ধীরে O.T.-তে ঢুকলাম। এটা আমার তৃতীয় বার O.T.-তে ঢোকা। বাবাঃ! যেন বিশ্বকর্মার কর্মশালা! ছয়-সাতজন ছেলেমেয়ে ব্যস্ত। কেউ মাথায় সবুজ টুপী পরছেন। কারো মুখে কাপড় (নাম জানি না) বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। কেউ একটি টুলে বসে পা নাচাচ্ছেন। একজন ডঃ মহিলা (মনে হয় অ্যানাস্থেটিস্ট) স্টেথো দিয়ে চেক আপ করতে শুরু করলেন। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, যে আমি সারা বছর বুকে ব্যথা, ধড়ফড়ানি ও সরবিট্রেট নিয়ে ঘুরি, তার আগের দিন E.C.G. Report Normal, B.P. Normal ।

O.T.-তে ডাক্তাররা নানা গল্প শুরু করলেন। নাম কি, কি করি, কতটা খাই, কম খাই না কেন, রোজ হাঁটি না কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। জিজ্ঞেস করলেন LMP-র date। Dec, 1976 বলাতে সমবেতস্বরে হাসি শুরু হয়ে গেলো। রাত্রে একটা রুটি খাই শুনে ওরা বিশ্বাসই করলেন না। ওদের আর বলিনি যে আমি ও কেয়া কলেজ থেকে একসাথে বেরোলে Capnil বা Mombasa-তে পঞ্চাশ, ষাট টাকার টিফিন খেয়ে ফেলি। আর দিন রাতের খাবারের হিসেব তো ঠিকই আছে। কথা বলা হচ্ছে আর শরীরে Needle ঢোকানো হচ্ছে। Drip-এর ব্যবস্থা হচ্ছে। ইতিমধ্যে Anaesthetist lady Dr. বলে উঠলেন, "ওকে Ryle's tube দিয়ে দাও।" আমি বললাম, " আপনার পায়ে পড়ি, আমার নাকে Tube ঢোকাবেন না।" জিজ্ঞেস করলেন- "কি খেয়েছেন? জল কখন খেয়েছেন?" বললাম, " অনিমা সিস্টার-এর কাছে। পাশের ঘরটায় বসে আছে। ঠিক দু' চামচ জল খেয়েছি বেলা ১২টাতে ওর কাছে। বিশ্বাস না হয় ওকে জিজ্ঞেস করুন।" ওরা হেসে ফেললো।

DO NOT COPY

তারপর শুরু হল Mask দেওয়া। মনে হল মুখের উপর একটি সিংহ লাফিয়ে পড়লো। তারপর আর মনে নেই ..... তখন প্রায় পাঁচটা বাজে ..... কতক্ষণ জানি না। আবার আবছা আবছা জ্ঞানে দেখলাম আমাকে ট্রলি-তে আবার ঠেলা হচ্ছে। কখনও অনিমার গলা, কখনও গীতাদির গলা। শুনছি অনিমা বলছে, "বাপী, তুই লম্বা। তুই স্যালাইনের বোতলটা ধর, আমি ঠেলছি।" কখনও গীতাদি বলছে এবার আমি ঠেলছি।" এর মধ্যে শুনলাম শম্ভুর গলা, "এক, দুই, তিন ...।" তারপর দেখলাম আমাকে বেড-এ নামাতে দুটি মহিলা ও তিনজন পুরুষ হিমসিম খাচ্ছে। অনিমা বলে উঠলো, " অক্সিজেনটা লাগিয়ে দে।" আমার কোনও নলই সহ্য হয় না। ইশারায় নিষেধ করলাম। এই মানসিক শক্তিটাই আমাকে এতো সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে।

অনিমা বসে ছিল O.T.-তে। ঐ সময়টুকুর মধ্যে Dr.-দের কাছে আমার Case History সব বলা হয়ে গেল। আমি Mountaineer, কত Peak Climb করেছি, etc. etc. ওর কাছে সান্দাকফু আর মাউন্ট এভারেস্ট-এর কোনও পার্থক্য নেই। তাঁরাও খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। আমার জ্ঞান ফেরবার পর তাদের Mode of Questions দেখে বুঝেছিলাম।

অপারেশানের পর জ্ঞান ফিরলে দেখলাম আমার অনেক অভিজ্ঞতা বেড়েছে। আমি জোরে কাশছি না, যদি সেলাই ছিঁড়ে যায়! আমি বমি করছি না। শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতে আমি চীৎকার চেঁচামেচি করে একাকার করতাম। আমি খেতে চাইনি। Drip চলছিলো বলে জল খেতেও চাই নি। Visiting hours-এ সাড়ে চারটার পর কেউ এলেও কিছু বলিনি। হাওড়ার অফিস থেকে আসতে বাপীরও মাঝে মাঝে দেরী হয়ে যেতো। তাতেও কিছু মনে করিনি। অথচ ১৯৭৬ সালের অপারেশন-এর সময়ে শ্রী প্রীতিকুমারের যদি Visiting hours-এ এক মিনিট দেরী হত, আমি জিনিসপত্র ছুঁড়ে, চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করতাম। তিনি কখনও দেরী করতেন না।

এবার আমার পেটে আবার দু'টি ফুটো করা হয়েছিল। তাকে বলে Drain রাখা। সে যে কি ব্যথা তা বলবার নয়। ছ' দিনের মাথায় সেই Drain Forceps দিয়ে বের করা হল। তাও সহ্য করলাম। এরপর দেখলাম আমার সঙ্গে যারা ভর্ত্তি হয়েছিলেন তারা সবাই বাড়ী চলে গেলেন। আমার আর ছুটি হয়না। Dr. Nan তাঁর হাউস স্টাফদের বলে দিলেন দশ দিনের আগে আমার Stitch-এ হাত না দিতে। এর মধ্যে জামাই ষষ্ঠী পড়লো। কৌশিক আমার খাবার নিয়ে গেছিলো। মোটামুটি ক্ষীণ স্বরে কৌশিককে বললাম- "ঐদিন চারটে গাওয়া ঘিয়ের লুচি একটু পটলের তরকারী দিয়ে নিয়ে আসিস তো!" কৌশিক ঘাড় নাড়বার আগেই কোথা থেকে এক Dr. (যিনি উল্টো দিকের পেশেন্টকে ড্রেস করছিলেন) এক লাফে এসে বললেন, "কি বললেন? গাওয়া ঘিয়ের লুচি? জীবনেও লুচি খাবেন না।" কৌশিক তো নিমেষেই অন্তর্হিত। আমার তো কাহিল অবস্থা। বিকেলে Visiting hours-এ কিশোর, কৌশিক ও বাপী Dr's Room-এ জিজ্ঞেস করতে গেলো আমি কি খাবো, কবে Stitch কাটা হবে, কবে ছুটি হবে etc. etc. এক Dr. বললেন- "সামনের শনিবার আমরা দেখবো, দরকার হলে পরের শনিবার নাগাদ ছুটি হবে।" হঠাৎ একজন হাত গোলগোল করে দেখিয়ে বললেন, "যাই খাওয়ান, গাওয়া ঘি-এর লুচিটুচি খাওয়াবেন না।" হয়ে গেলো আমার ভোজন বিলাস!

অনিমাকে বলা হল পেটে অনেক সেলাই করা হয়েছে। এত ফ্যাট চেঁচে বাদ দিতে হয়েছে যে গুহার মতো হয়েছে। ব্লিড করবে। একটু সাবধানে থাকতে হবে। আর একজন বলেছেন পেশেন্টকে একদম খেতে দেবেন না। অনিমা বললো- "আপনার ঠিকানাটা দিন তো।" তিনি কারণ জিজ্ঞেস করাতে অনিমা বললো – "খেতে না পেলে ও আপনাকেই খেয়ে নেবে।"

যাইহোক, ছুটি আর হয় না। Dr. Nan না বললে ছুটি দেওয়া হবে না। আমার অতদিন আটকে থেকে প্রাণ যায়।

DO NOT COPY

শেষ পর্যন্ত ১০ই জুন বাঙলা বন্ধের ডাক হলো। আমি কোন ভাবেই আর থাকতে রাজী নই। দুপুর থেকে Ready হয়ে বসে আছি। Dr.-রা Discharge Certificate আর দেন না। শেষ পর্যন্ত রাগারাগি করে অনিমাকে Dr's Hostel-এ পাঠানো হল। অনেক কষ্টে সে একটি Certificate লিখিয়ে নিয়ে এলো। সেদিন সুভাষদা আর চিত্রা এসেছিলেন। সুভাষদাকে দিয়ে সই করিয়ে সোজা একতলায়। প্রচণ্ড বৃষ্টি নামলো। আমার হঠাৎ মনে হল Dr.-রা দেখলে আমাকে আটকে দেবেন। আমি ঐ অসুস্থ অবস্থায় সোজা বেলগাছিয়া রোড। তারপর অতি কষ্টে একটা ট্যাক্সি জোগাড় করে সোজা বাড়ী। সব শান্তি।

কিন্তু বিধি বাম। বাড়ী আসবার পর আবার ব্যথা, আবার শরীর খারাপ। আবার হসপিটাল। এক গাদা ইঞ্জেকশান, একগাদা অ্যান্টিবায়োটিক। সে শরীরটা আর সারছে না।

বাড়ীতে যত্ন হচ্ছে না একথা বলবো না। খুবই হচ্ছে। কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমার থাকলে সমস্ত বাড়ীর লোককে অতিষ্ঠ করে দিতেন – ওকে খেতে দাও, ওকে ওষুধ দাও। বাড়ী ফিরেই কোনমতে হাত পা ধুয়ে কাছে এসে বসতেন। যতক্ষণ আমার রাতের খাওয়া না হত নিজে খেতেন না। এখন আমার ছেলে বা সোমা খুবই যত্ন করে। কিন্তু বাড়ীটা ফাঁকা মনে হয়। বাপী অফিসে গেলে তো সারা বাড়ী নিস্তব্ধ। আর সোমা এতো ছোট যে তার সঙ্গে গল্পও করা যায় না। কাজগুলি সময় মতো করে যায়। তাই অভিযোগ করবারও কিছু নেই।

অনিমাও আর আসেনি। মেয়ের পরীক্ষা বলে সময় পাচ্ছে না মনে হয়। আমাদের দিন কেটে যাচ্ছে। এবার আর পুরী যাওয়া হল না। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আমি রথযাত্রায় অনুপস্থিত। মানুষ ইচ্ছে করলেই সব হয় না। এর জন্য একটি ঐশী শক্তি কাজ করে। আমরা কেউই তার ঊর্দ্ধে যেতে পারি না।

DO NOT COPY

লেখার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় যদি কেউ লেখবার মাঝখানে হাজির হয়। আমরা এত দুর্ভাগা যে কোনও ছুটির দিন পড়লেই হয় কারো আমার কথা মনে পড়ে, নয় বাপীর কথা। হয়তো বৌ বাপের বাড়ী আছে, স্বামী বন্ধুর সাথে দেখা করতে এলো। তারা একবারও মনে করেনা বাপীরও একটি বৌ আছে। সেও কোথাও যেতে পারে বা বৌ-এর সাথে গল্প করতে পারে। আমরা এই জগতে বাস করি। একমাত্র উপায় হল দরজায় তালা ঝুলিয়ে কোথাও চলে যাওয়া। বাপীকে আমি বারাসাত পাঠাবার চেষ্টা করছি। কারণ এই চেনা বাড়ীটা আমাদের Immediately ত্যাগ করা দরকার। কারণ আমার সময়ে কেউ আসেনা। তাদের দয়া হলে তবে আসবে। কে কখন মনে করবে, রাত দুপুরে দল বেঁধে হাজির হবে, দেখলে শ্রীপ্রীতিকুমার খুব ক্রুদ্ধ হতেন। আমিও বিরক্ত হচ্ছি। অতএব .....

- - - - - - - - (** রচনাকাল – আগস্ট, ১৯৯২)

শ্রী অরবিন্দের বাণী

"সরস্বতী মানুষের সক্রিয় চেতনার মধ্যে নিয়ে আসেন সেই বিপুল প্লাবন, সেই বিপুল গতিধারা, স্বয়ং সত্যময় চেতনা- যার কল্যাণে আমাদের যাবতীয় চিন্তাবৃত্তিকে তিনি জ্যোতির্ম্ময় করে তোলেন।

শুদ্ধিপ্রদা দেবী সরস্বতী, তাঁর সকল রূপের পূর্ণতায় পূর্ণ হয়ে, বুদ্ধি-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের এই যজ্ঞ কামনা করেন যেন।"

DO NOT COPY

স্বাধীন তুমি

শ্রীমা

স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ বলত? যা তোমার ভাল লাগে তাই তুমি ইচ্ছামতন করে বেড়াবে - এই কি স্বাধীনতা? কিন্তু, তুমি কি জান তোমার এই "তুমি" বস্তুটি কী? তুমি কি জান তোমার নিজস্ব ইচ্ছা কী? তুমি কি জান কোন চিন্তাটি তোমার অন্তর থেকে আসছে আর কী কী আসছে বাইরের জগত থেকে? তোমার যদি নিজস্ব দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকে তাহলে তোমার সঙ্কল্প অনুযায়ী তুমি কাজ করতে পার। কিন্তু তা যদি না থাকে? সাধারণতঃ তোমার সাময়িক আবেগই তোমায় চালিত করে। আবার সব আবেগই তোমার নিজস্ব আবেগ নয়। কতশত আবেগ বা প্রেরণা বাহিরের থেকে এসে তোমাকে দিয়ে সর্বরকমের বোকামির কাজ করিয়ে নেয়। তখন তুমি রাক্ষস বা পিশাচের কবলে পতিত হও। তারা তোমাকে প্রথমতঃ আহাম্মকের মত কাজ করায়, পরে তোমার দুর্গতি দেখে হাসতে থাকে।

যদি তোমার ইচ্ছাশক্তি বলবতী হয়, যদি তোমার সঙ্কল্প, আবেগ, প্রেরণা এবং আর সবই কেন্দ্রিত হয় চৈত্য সত্তার চৌদিকে, তাহলে ঐরূপ পরিস্থিতিতেই তুমি পেতে পার মুক্তি ও স্বাধীনতার আস্বাদন, অন্যথা তুমি একটি ক্রীতদাস মাত্র।

** শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে

"প্রার্থনা করো – যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

- কাজী নজরুল ইসলাম

DO NOT COPY

পার্থসারথি সুরাসুর নর মুনি ঋষি প্রভৃতি বন্দিত অর্চিত-পূজিত সর্বালোকালোক বিদিতি। তিনি বিশ্বত্রাতা বিশ্বভর্তা বিশ্বনিয়ন্তা। ইনি কেবলমাত্র পৃথা-পুত্র-পার্থ-রথের সারথি নহেন, তাঁর মনোরথেরও সারথি, আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সর্বলোকের সকল লোকপালের তথা দৃশ্যাদৃশ্য যা কিছু আছে সে সবের হৃদয় সারথি। তাঁরই সারথ্যে প্রেমে জ্ঞানে আনন্দে ঐশ্বর্যে সকলেই আপুরিত এবং স্ব স্ব ধর্মে কর্মে নিরত। তাঁরই ভয়ে অগ্নি দেয় তাপ, সূর্য দেয় উজ্জ্বল কিরণ, ইন্দ্র বায়ু, এমন কি মৃত্যুপতিও স্ব স্ব কর্মে ধাবিত ও নিরত। ভগবান পার্থসারথি তাই বললেন নিজ স্বরূপের বিষয় প্রিয় সখা অর্জুনকে।

শশাঙ্ক পাবকসূর্য সেই পদ প্রকাশে অক্ষম।
সে মোর পরমধাম যেথা গেলে না হয় জনম।

এই পার্থসারথিই বাসুদেব - বাসুদেবঃ সর্বমিতি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মা, ঈশাবাস্য মিদং সর্বম্। শ্রীভগবান বললেন-

বহু জন্ম অতিক্রমি জ্ঞানী ভক্ত দেখিবারে পায়।
এই সবি বাসুদেব সে মহাত্মা দুর্লভ ধরায়।।

সেই বিশ্বময় বিশ্বাত্মা বিশ্বদেবকে জানা যায় তাঁরই জ্ঞানে তাঁরি বুদ্ধিতে শক্তিতে জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, শক্তিমান ও আত্মবান সাধর্মবান হলে। এরূপ ব্যক্তিকে তিনি স্বয়ংই বরণ করেন, গ্রহণ করেন, আপনজন, প্রিয়জন করে নেন। কেননা তিনিই বলেছেন-

যে ভজে যেমন মোরে আমি ভজি তাহারে তেমন।
হে পার্থ! সর্বতোভাবে মমপথে চলে সর্বজন।

ইহা তাঁর অঙ্গীকার - সমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ (মুণ্ডক) ভক্তের প্রতি ভগবানের অশেষ কৃপা ও অনবদ্য করুণা। যেহেতু তিনি কৃপাময় কৃপাস্বরূপ, দয়াময়

দয়াস্বরূপ, জ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমময় প্রেমস্বরূপ, সত্যময় সত্যস্বরূপ, চৈতন্যময় চৈতন্যস্বরূপ, তিনি অনন্ত অনন্তস্বরূপ, তিনিই বিরাজিত নিখিল ভুবনে রসময় রসস্বরূপ হয়ে। এই সবই তাঁরই অবয়ব, এই সবই তাঁরই লীলাক্ষেত্র, এমনকি এই দেহ তাঁরই আবাস ও বিলাস মন্দির। বৃহদারণ্যকোপনিষদে তাই উক্ত "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী নবেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিব্যামন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।" যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেও পৃথিবী হতে স্বতন্ত্র, যাঁকে পৃথিবী জানে না কিন্তু পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি পৃথিবীর সকল অবয়বে ওতঃপ্রোত ভাবে অনুস্যুত থেকে তাকে সম্যকরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন, ইনিই সেই অন্তর্যামী আত্মা অমৃতস্বরূপ। অনুরূপই জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সর্বভূত, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান সেই আত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত আচ্ছাদিত এবং কেবল তাই নহে এই সব হয়ে বিলসিত। আর এই আত্মাই সেই বাসুদেব পার্থসারথি। তাই প্রিয়সখা অর্জুনকে বললেন-

হের মোর যোগৈশ্বর্য ভূতে নাই ভূত না আমাতে।
ভূতের ধারক আমি প্রতিপাল্য হয় আমা হতে।।
অব্যক্ত স্বরূপ আমি এসকল জগদ্ব্যাপে রহি।
আমাতেই ভূতগণ স্থিত কিন্তু আমি তাতে নহি।।

আরো বললেন-

অজ্ঞেরা তো নাহি জানে মোর নিত্য সর্বোত্তম রূপ।
অব্যক্ত আমাকে ভাবে ব্যক্ত আমি মনুষ্য স্বরূপ।।
আমি যে অব্যয় অজ মূঢ়গণ না হয় বিদিত।
ব্যক্ত না হই সবার কাছে থাকি যোগ মায়াবৃত।।

আবার বললেন কৃপা করে অর্জুনকে –

সকল যজ্ঞের ভোক্তা ফলদাতা আমি সবাকার।
তত্ত্বতঃ না জানি মোরে ঘুরে জীব সংসার মাঝার।।

DO NOT COPY

আমা হতে জগতের উৎপত্তি ও হয় প্রবর্ত্তন।
উহা জানি প্রেমভরে আমাকেই ভজে জ্ঞানীজন।।
দেহ মধ্যে বৈশ্বানর রূপে থাকি বায়ু প্রাণাপান।
চর্ব্য আদি চতুর্বিধ অন্ন আমি করি পচ্যমান।।

অবিদ্যা অস্মিতাচ্ছন্ন মানব তাঁর এই তত্ত্ব জানতে পারে না, ধারণা করতে পারে না, অনুভব করতে পারে না। কারণ আকাশের নীচে উপুড় করে রাখা ঘটে কিম্বা ঘরের মধ্যে উপরমুখী করে রাখা ঘটে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয় না প্রবল বারিপাত হলেও। তেমনি পরমেশ্বর দেহ মধ্যে এবং সর্বগত সর্বতো ব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও তাঁর ঐশ্বর্যাদি প্রকাশিত হয় না। যেমন ছিন্নভিন্ন বীনা যন্ত্রে অভিজ্ঞ বীণাবাদক তার রাগরাগিনীর সুর তুলতে পারে না, যেমন ভাঙ্গা কণ্ঠে কোন গায়ক গান গাইতে পারে না, তেমনি তাঁর সত্য জ্ঞান অনন্ত সত্তা সচ্চিদানন্দ সত্তা সর্বত্র ব্যাপ্ত হলেও বৈকল্য দেহ যন্ত্রে অপ্রতিবোধিত মনোবীণায়, অনাপ্যায়িত হৃদয় দর্পণে অপ্রকাশ্যই থাকে। যেমন সূর্যরশ্মিতে অগ্নি থাকলেও ঘর পুড়ে না কিন্তু কৌশল ক্রমে অতসী কাঁচের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত রশ্মিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। তাই শ্রীভগবান গীতায় বললেন- "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্" - কর্মের কৌশল যাহা তারই নাম যোগ। আরও বললেন-

অত্যাহার অনাহার অতিনিদ্রা অতিজাগরণ।
করে যেই হে অর্জুন! যোগ তার না হয় কখন।।
যুক্তাহার ও বিহার বিধিমত কর্ম যেই করে।
পরিমিত নিদ্রে জাগে তার যোগ সর্বদুঃখ হরে।।

এই যোগ, যোগপথ্য ও নিয়মিত জীবন চারণের ফলে দেহ ও দেহযন্ত্র সমূহ হয় আপ্যায়িত প্রতিবোধিত সকল সতেজ ও সুক্রিয় সুতীক্ষ্ণ। ইহার দ্বারা সাধক অনন্য মানসে অনন্য চিত্তে ঈশ্বর স্মরণ মনন ধ্যান ধারণা করেও আত্মসমর্পণ করে। এই আপ্যায়িত প্রতিবোধিত দেহ যন্ত্রেই তাঁর সকল ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয় এমনকি সাধক তৎ স্বরূপে প্রকটিত হয়।

DO NOT COPY

বস্তুতঃ এই দেহযন্ত্র একটি রেডিও বা টি ভি যন্ত্র বিশেষ। এই যন্ত্রে থাকে কতকগুলো তার (wire) সুইচ, ব্যাটারী ব্যাণ্ড, স্পিকার তেমনি দেহযন্ত্রে আছে কোটি কোটি স্নায়ু যেন তার; প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু যেন সুইচ, খাদ্যজাত তাপ যেন ব্যাটারী, মূলাধারাদি মস্ত চক্র যেন ব্যাণ্ড, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যেন স্পিকার আর সেন্টারে থাকে বক্তা তেমনি এই দেহে হিতা নামক নাড়ীতে থাকেন নিত্যকালের বক্তা পরমাত্মা- আবার যন্ত্রের মালিক শ্রোতা, তেমনি দেহ মন প্রাণ ও সংকল্পযুক্ত অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবাত্মা হল শ্রোতা। জীবাত্মা যোগাদি অনুশীলন করে ও পরিমিত আহারাদি করে এই দেহকে আপ্যায়িত প্রতিবোধিত করলে পর এই দেহই হয় পরমাত্মার বরণযোগ্য - লীলাবিলাস যোগ্য মন্দির অধিষ্ঠান। ইহাতেই তাঁর সকল ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়, তিনি স্বয়ংই ইহাতে প্রকটিত হন জীব হয় তখন শিবস্বরূপ। শ্রীভগবান তাই বললেন-

অনন্য চিত্তেতে মোরে যাঁরা নিত্য করেন ভজন,
আমি যে তাঁদের তরে যোগক্ষেম করিতো বহন।।

আরো বললেন- মন্মনা মদ্ভক্ত হও মোরে পূজা করো নমস্কার।
তুমি মম প্রিয় অতি মোরে পাবে করি অঙ্গীকার।

সেই সঙ্গে এও বললেন- পত্র পুষ্প ফল জল দিলে ভক্ত মোরে ভক্তিভরে।
আমি সেই ভক্তদত্ত উপহার খাই সমাদরে।।

এইরূপ হল ভক্তের ভগবান পার্থসারথির অঙ্গীকার।

যেমন গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা হয়, সূর্যালোকেই সূর্যকে দেখা যায় তেমনি ভগবান পার্থসারথির জ্ঞান প্রেম প্রজ্ঞায় সাধক তাঁকে পুজো করে এবং অবগত হয়-

যস্মাৎ ক্ষরমতিতে ২হমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।

অর্থাৎ অক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর আমি ক্ষরের অতীত।
আমিই পুরুষোত্তম সেই হেতু ত্রিলোক বিদিত।

DO NOT COPY

বস্তুতঃ যখন কোন সাধক তাঁকে জেনে শুনে তাঁর যোগ্য হয়ে উঠে তখন তিনি সেই যোগ্য ভক্তকে বরণ করেন, আপনজন করে নেন। যেমন যোগ্যা যুবতী যোগ্য যুবাকে কিম্বা যোগ্য যুবা যোগ্যা যুবতীকে বরণ করে। ইহা বিনা মানব তার মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে জানতে পারে না। কূপমন্ডুক কূপকে ও কূপান্তর্গত সুখকে জানে আর সমুদ্র মণ্ডুক সমুদ্রকে ও সমুদ্র সুখকেই জানে এবং তাতে নিত্য স্নান করে সমুদ্র সুখ ভোগ করে; তাছাড়া সমুদ্রও তাকে আত্মসাৎ করে যথাকালে।

ভগবদ্ভক্তের জন্য ভগবানের অঙ্গীকার নিত্যকালের, ইহা স্মরণ মনন করায় আমার পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুত প্রীতি কুমার ঘোষ মহাশয় প্রবর্তিত মাসিক পত্রিকা পার্থসারথি; সেই অঙ্গীকারকে প্রতি ঘরে প্রতিটি মনের মণিকোঠায়, হৃদয়দ্বারে বহন করে আনে এই পত্রিকাটি।

সুদীর্ঘ একনিষ্ঠ ব্রতে ব্রতী পত্রিকা আপন প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বহুজন মনের বহুজন প্রাণের খোরাক যোগান দেয় বা দিয়ে চলেছে ইহা স্মরণ করলে অবাক হতে হয়। ইহা যে সেই ভগবান পার্থসারথির পরম করুণা ও আশীর্বাদ তা বলাবাহুল্য মাত্র।

আমরা প্রার্থনা করি সেই ভগবান পার্থসারথির রাতুল চরণে - 'পার্থসারথির' সম্পাদক মহাশয় দীর্ঘায়ু লাভ করুন। সুস্থ ও সবল তনুমনের অধিকারী হয়ে পত্রিকা পার্থসারথিকে দীর্ঘস্থায়ী করে বহুজন সমক্ষে এনে দিন ভগবানের মর্মকথা। তিনি কৃতার্থ হউন এবং আমাদেরকেও কৃতার্থ করুন ঈশ্বরের বাণী পরিবেশন করে সত্য-নিত্য স্বরূপকে প্রকাশ করে।

ওঁ ভগবতে পার্থসারথয়ে নমঃ! পার্থসারথয়ে নমঃ ওম্।।

DO NOT COPY

বিজ্ঞানের সত্য এবং সাহিত্যের সত্য

শ্রী দিব্যজ্যোতি রাহা

বেশ কয়েক বছর আগে আমার পরমাত্মীয় এক অখ্যাত কবির কলম থেকে দু'টি লাইন বেরিয়েছিল,

'আজ থেকে এক আলোকবর্ষ দূরে, যদি ফের দেখা হয় দু'জনে,
তারাভরা কোন এক ছায়াপথে, নিঃশব্দে নির্জনে।'

কবিতার সেই লাইন দু'টি পড়ে এক বিজ্ঞানমনস্ক বাল্যবন্ধু মন্তব্য করেছিলেন, আলোকবর্ষ তো দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি। এক বছরে আলো যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে, তার পরিমাপ। এখানে সেটাকে সময়ের হিসাব কষতে ব্যবহার করা হল কি করে? এটা কি বিজ্ঞানসম্মত হল? সত্যের অপলাপ হল কি না?

কবিগুরুর ভাষায় জবাব এসেছিল আরেক বাল্যবন্ধুর কাছ থেকে, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।'

আপাতনিরীহ এই ঘটনা থেকেই শুরু হয়েছিল এই ভাবনার। বিজ্ঞানই কি শুধু সত্যাশ্রয়ী? শিল্প বা সাহিত্যে কি সত্যের স্থান কোথাও নেই? তারা কি শুধুই কল্পনার কারবারী?

একেবারে ছেলেবেলায় প্রথম শেখা নীতিবাক্যটি হল, 'সদা সত্য কথা বলিবে'। আরো একটু বড় হওয়ার পরে স্কুলের উঁচু ক্লাসে পৌঁছে আর একটি সংস্কৃত নীতিবাক্য শেখা হল, 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'। দুই উপদেশবাক্য মিলিয়ে জানা গেল যে মিথ্যা যেমন কখনো বলা যাবে না, তেমনই আবার সত্য কথা যদি অপ্রিয় হয়, তাও বলা উচিত হবে না। এই দুই পরস্পরবিরোধী অনুশাসনের দোলাচল সম্পূর্ণ বোধগম্য হবার আগেই পরিচয় ঘটল শঙ্করাচার্যের বাণীর সাথে, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ

DO NOT COPY

মিথ্যা'। ব্যস্, সব কিছু ঘেঁটে 'ঘ' হয়ে গেল। ব্রহ্ম সম্পর্কে আমরা অজ্ঞান। তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞানীদের কাছ থেকেও সঠিক ব্রহ্ম-ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় মনে প্রশ্ন জাগে, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহলে প্রকৃত অর্থে সত্য কি এবং সে সত্য কোথায়?

সত্যের অনুসন্ধানই জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, এ'সব কিছুই মূলত সত্যান্বেষণেরই সাধনা। বিজ্ঞান এবং সাহিত্য সম্পর্কে জনমানসে সাধারণত একটি ধারণা আছে যে বিজ্ঞানের কারবার সত্য নিয়ে, আর সাহিত্য হল কল্পনাশ্রয়ী। কল্পনায় সাধারণত সত্যের অপলাপ ঘটে। তাই সত্য এবং সাহিত্য পরস্পরবিরোধী। অন্য কথায়, সাহিত্যে সত্যের কোন স্থান নেই। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তা বলাই বাহুল্য। সাহিত্যেও যে সত্যের স্থান আছে, আবার বিজ্ঞানেও যে কল্পনার প্রয়োজন আছে, এই বোধটুকু অনেকেরই নেই। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানী এবং সাহিত্যিক – উভয়েই এক এবং অদ্বিতীয় সত্যের সন্ধানে ব্রতী। এই প্রসঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একটি ভাষণ স্মরণ করা যেতে পারে, "কবি এই বিশ্বজগতে তাঁর হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া সেই অরূপকে দেখিতে পান। তাহাকে তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায়, সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় সেই একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।"

জগদীশচন্দ্রের বক্তব্যের সারমর্ম হল, সাহিত্যিকের এবং বৈজ্ঞানিকের কর্মপন্থা ভিন্ন হলেও উভয়ের অভীষ্ট অভিন্ন। উভয়েই সেই এক এবং অদ্বিতীয়

DO NOT COPY

সত্যের সন্ধানী – যে সত্যে কোন বৈপরীত্য নেই, যে সত্যে উপনীত হলে সব বিরোধের অবসান ঘটে। 'সত্য' শব্দটির ব্যবহার আবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে হয়ে থাকে। দর্শনশাস্ত্রে সত্যের ব্যবহার দেখা যায় সত্তা বা 'রিয়্যালিটি' অর্থে। যার অস্তিত্ব আছে, যা সত্তাবান, তাই সত্য। ধর্মশাস্ত্রে আবার সত্য আর ঈশ্বর সমার্থক। আমরা বলি, 'ট্রুথ ইজ গড।' শঙ্করাচার্যর 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বাণীটিকে আরও একটু বিশদে বললে ব্রহ্মই নিত্য, একমাত্র পরিবর্তনহীন সত্তা। তা'ছাড়া বাকী প্রাতিভাসিক জগৎ সবই মিথ্যা। আবার রামানুজের ব্যাখ্যা অনুসারে, প্রাতিভাসিক জগৎ মোটেই মিথ্যা নয়; তা অনিত্য, চলমান, এবং পরিবর্তনশীল। এই অনিত্য জগৎ একটি নিত্য সত্তাকে আশ্রয় করে রয়েছে। 'ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য।' কবিগুরুর ভাষায়, 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি'। অরূপকে আচ্ছাদিত করে রয়েছে যে রূপ, তাতেই বিধৃত হয়ে আছে জগৎপ্রতিমার লালিত্য, তার সৌন্দর্য। প্রাতিভাসিক জগৎটা যদি মিথ্যা হয়, সেই মিথ্যাই তবে জগৎপ্রতিমার বহিরঙ্গের রূপ। আর ব্রহ্ম হল খড়বিচালি দিয়ে তৈরি সেই প্রতিমার ভিতরের কাঠামো। প্রতিমার কাঠামো যদি সত্য হয়, তবে তার বাহ্যরূপও সত্য।

বিজ্ঞান কোন সত্যের অনুসন্ধান করে? প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত যে যে ঘটনা ঘটে চলেছে, তার নেপথ্যে কোনও কারণ, কোনও নিয়ম আছে কিনা, বিজ্ঞানীরা তারই অনুসন্ধান করে থাকেন। বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী বিশ্বজগৎ সম্পূর্ণরূপে নিয়মের অধীন। এখানে কারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না। বস্তুজগতে প্রতিনিয়ত যে ঘটনাপ্রবাহ চলছে, তার প্রত্যেকটির নেপথ্যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির এইসব নিয়মকে নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফেইনম্যান 'দেবতাদের রুলস অফ দ্য গেম' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতানুযায়ী এই

DO NOT COPY

বিশ্বজগৎ যেন একটি বিশাল দাবার ছক। দেবতারা নেপথ্যে বসে খেলছেন আর আমরা নিছক দর্শক হিসাবে সে খেলা প্রত্যক্ষ করছি। তাঁদের খেলার নিয়ম বা 'রুলস অফ দ্য গেম' সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। তবে আমরা যদি দীর্ঘদিন ধরে গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁদের খেলা পর্যবেক্ষণ করতে থাকি, তাহলে কী কী নিয়মে সেই খেলা চলছে, তার কিছু ধারণা বা আভাস পাওয়া সম্ভব। এই 'রুলস অফ দ্য গেম'গুলির অনুসন্ধান করাই বিজ্ঞানীদের কাজ। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, 'আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ নানাবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাপরম্পরার ধারাবাহিকতা বা সূত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাই হল বিজ্ঞান'।

বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস করে তাঁদের বিজ্ঞানসাধনা করেন। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত প্রকৃতি যে যে নিয়মে কাজ করে চলেছে, ভবিষ্যতেও সেইসব নিয়ম একই রকম ভাবে বলবৎ থাকবে, বিজ্ঞানীদের সত্যানুসন্ধান এই ধারণার উপরে নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তাদের মতবাদকে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন এবং সেই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন মতবাদ সমর্থিত হলে তাকে নির্দ্বিধায় সত্য বলে গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত যাকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলে মনে হচ্ছে, চিরকাল প্রকৃতি সেই একই নিয়মে চলবে, এ'কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পর্যবেক্ষণের দ্বারা পরীক্ষিত সত্যও যে পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হয়েছে, এমন উদাহরণ ইতিহাসে অমিল নয়। কাজেই বিজ্ঞানে আজকের প্রমাণিত সত্য সাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে সত্য হলেও চিরন্তন অভ্রান্ত সত্য নাও হতে পারে।

বিজ্ঞানের এই বস্তুনিষ্ঠ সত্যের সাথে সাহিত্যের নান্দনিক সত্যের মৌলিক পার্থক্য আছে। বলা বাহুল্য, সাহিত্য বলতে এ'ক্ষেত্রে গদ্যরচনা ছাড়াও কাব্য, এমনকি

DO NOT COPY

চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকেও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত করতে হবে। সাহিত্যের সত্যবোধ আর বিজ্ঞানের সত্যবোধ এক নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, 'বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের সাধনা। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য; তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে যায় না। এমনকি সেই অদ্ভুতের, সেই অসত্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয়, তবে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হয়'। সাহিত্যের সত্যের এই বৈশিষ্ট্যটি সুন্দরভাবে বিধৃত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়। ক্রৌঞ্চ-নিধনের পরবর্তী সময়ে শ্লোক-রচনার দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠা শোকাভিভূত বাল্মীকিকে মহর্ষি নারদ পরামর্শ দিলেন রাম-জীবনী নিয়ে মহাকাব্য রচনার। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাল্মীকির জবাব –

'জানি আমি জানি তারে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা'
কহিলা বাল্মীকি; তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা;
সকল ঘটনা তার – ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে?
পাছে পথভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।

এর উত্তরে মহর্ষি নারদের বক্তব্য আমাদের এই আলোচনায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান। অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির সারমর্ম হল, সাহিত্য বাস্তব সত্যের দাস নয়। সত্য বা অসত্যের বিচারে বাস্তবের সাথে তার মিল নাও হতে পারে। সৎ সাহিত্য

DO NOT COPY

বাস্তবানুগ হবে, এ'কথা যেমন ঠিক; আবার সাহিত্যকে যে বাস্তবের ফোটোকপি হতেই হবে, তা কিন্তু নয়। সাহিত্যকে রসোত্তীর্ণ করার প্রয়োজনে তার স্রষ্টা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে বাস্তবের তারতম্য ঘটাতেই পারেন। এবং বাস্তব থেকে সে'টুকু বিচ্যুতির ফলে সেই সৃষ্টির সাহিত্যমূল্য কিন্তু কোনোভাবে খর্বিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের উল্লেখ করা চলে। সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচকদের মতে, ম্যাকবেথের ট্র্যাজেডিকে আরো গভীর এবং মর্মস্পর্শী করার উদ্দেশ্যেই শেকসপিয়ার ইতিহাসের সত্য থেকে সরে এসে ঘটনাপ্রবাহকে স্বাধীনভাবে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। ইংরাজিতে একেই poetic licence বলে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে বলেছেন, 'ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে একটি বিশেষ রসের সঞ্চার হয়, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। ... লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল'। তবে সর্বজনবিদিত সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ ঘটালে তা পাঠকমনে আঘাত হানে এবং সেই সাহিত্য সার্থক হয় না।

সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হল রসসৃষ্টির মাধ্যমে পাঠকের মনোরঞ্জন করা। যে সাহিত্য পাঠে পাঠকের মনে আনন্দের সঞ্চার হয়, তা-ই সার্থক সাহিত্য। শিশুমনে আনন্দ আর বিস্ময় জাগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' রচনা করেছিলেন। তার সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। আজও বইটির ছড়াগুলি পাঠ করে শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই এক নিষ্পাপ আনন্দলাভ করেন। সেই কারণেই বাস্তব সত্যের বিচারে তাদের বর্ণনায় হাজার অসঙ্গতি বা অতথ্য থাকা সত্ত্বেও

DO NOT COPY

হাসজারু, ট্যাঁশগরু অথবা রামগরুড়ের ছানারা আর নিছক কল্পনা থাকে না। সার্থক সাহিত্য হিসাবে তারা সকলেই সত্যের মর্যাদা লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক পার্মেনিদিসের একটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। 'যা তুমি চিন্তা করতে পারো, তারই অস্তিত্ব আছে। যার অস্তিত্ব সত্য নয়, তা তুমি কল্পনা করতে পারো না'। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে যে সকল ধারণা গড়ে ওঠে, আমাদের ভাবনার বৃত্ত তারই মধ্যে আবর্তিত হয়। যা আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই, তা কল্পনা করা আমাদের সাধ্যের অতীত। বাস্তব জগতে যেমন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু রাসায়ানিক বিক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থ গঠন করে, আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ মানসজগতে তেমনই বিভিন্ন ধারণার ঐচ্ছিক মিলনে সৃষ্টি হয় নানা বিচিত্র কল্পবস্তুর বা কল্পপ্রাণীর। বিভিন্ন মহাকাব্যে, রূপকথায় এবং কল্পকাহিনীতে এর অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের অভিজ্ঞতায় গরু, ঘোড়া, পাখি ইত্যাদির সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, সেইসব ধারণাকে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে একটির সাথে অন্যটিকে জুড়ে আমরা পক্ষীরাজ ঘোড়া, হাঁসজারু ইত্যাদি নতুন নতুন কল্পপ্রাণীর সৃষ্টি করে নিতে পারি। সাহিত্যে সাহিত্যিকের ভূমিকা সৃষ্টিকর্তার। ভাবজগতের ধারণাগুলিকে উল্টেপাল্টে সৃষ্টির এই প্রচেষ্টাকে সৃষ্টিকর্তাকে অনুকরণেরই প্রয়াস বলা চলে। অভিজ্ঞতালব্ধ বহির্জগৎ থেকে আহরণ করা ধারণাগুলি সাহিত্যিকের মানসজগতে যে বহুবিচিত্র নকশা গঠন করে, সাহিত্যে তারই প্রকাশ দেখা যায়। যেহেতু সাহিত্যিকের মনোজগতে প্রতিভাত সত্যের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ভাষায় সবসময়ে সম্ভবপর হয় না, তাই অনিবার্যভাবেই সাহিত্যের ভাষায় নানাবিধ প্রতীক, চিত্রকল্প স্থান করে নেয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কবির কল্পনায় রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতি

DO NOT COPY

মিলে মিশে একাকার হয়ে এক নতুন অনির্বচনীয় মিশ্র-অনুভবের সৃষ্টি হয়। কবির লেখনী তাই লিখতে পারে, 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল' অথবা 'শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা আসে'।

সাহিত্য এবং শিল্পের মধ্যে সাধারণত তাদের স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনটা হয় না। লেখক বা কবির লেখা পড়ে, তার রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে, সাধারণত অভিজ্ঞ পাঠক তার স্রষ্টাকে চিনতে পারে। একই ভাবে অভ্যস্ত দর্শক অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীর ক্যানভাস দেখে ছবিটা কার আঁকা বলে দিতে পারে। তার অন্যতম কারণ সাহিত্য এবং শিল্পের মধ্যে সাধারণত স্রষ্টার ব্যক্তিসত্তার ছাপ পড়ে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা হয় না। সাহিত্যিক বা শিল্পী তাঁদের নিজস্ব অনুভূতি বা ভাবনাকেই তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা হয় দর্শক বা ব্যাখ্যাকারের মত, নৈর্ব্যক্তিক।

অবশ্য, আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী, যে সাহিত্যে লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা বা অনুভূতিকে ছাপিয়ে এক নৈর্ব্যক্তিক সত্য প্রকাশিত হয়, সেই রচনাকেই সুসাহিত্য বলা যায়। সাহিত্যে যখন কোনো ব্যক্তিবিশেষের সুখ-দুঃখের কাহিনীকে আশ্রয় করে ব্যক্তি নির্বিশেষে মানুষের চিরন্তন আনন্দ-বেদনার অনুভূতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তা সৎ-সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত হয়। সেক্ষেত্রে, একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো বিশেষ সত্য সাহিত্যের মাধ্যমে এক সার্বজনীন সত্যের ইঙ্গিতবাহী হয়ে ওঠে। সেই সত্যই সাহিত্যের সত্য।

DO NOT COPY

তারকনাথের তারকেশ্বর **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

স্বয়ম্ভূ তারকনাথের তারকেশ্বর! শ্রাবণ মাসের সোমবারে 'ভোলেবাবা পার করেগা' বলতে বলতে মূলতঃ শ্যাওড়াফুলি থেকে বাঁকে জল নিয়ে ভক্তের দল প্রায় ৩৭ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে যে শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালতে যায় - সেই তারকেশ্বর। দর্শন অথবা পুজো দেওয়া তো দূরে থাক, সে সময় বাবার মাথায় সরাসরি জল ঢালাও অসম্ভব। দেবতার পূজা যখন বন্ধ থাকে তখন ভক্তরা জল ঢালে এক চোঙার ভিতরে যেখান থেকে ভক্তির জল পৌঁছে যায় বাবার মাথায়, আর পূজা চলাকালীন সেই নল দেওয়া হয় সরিয়ে।। সেই সময় ভক্তজন অপেক্ষা করেন অধীর আগ্রহে। শুধু তো জল ঢালা নয়, রয়েছে মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত দুধপুকুরে ডুব দেওয়ার প্রথাও। শুধু শ্রাবণের সোমবার নয়, ভিড় হয় চৈত্র-বৈশাখ মাসেও – বিশেষতঃ গাজন উৎসবের সময়। আর শিবরাত্রি? এই বিশেষ দিনটিতে কত যে ভক্ত বাবার মাথায় জল ঢালতে আসে সে হিসেব দেওয়া বোধহয় সবজান্তা গুগলেরও অসাধ্য। এ হেন তারকেশ্বরের ডাক আমার ঘরনীকে পাগল করেছিল ৪ই মার্চের কাকভোরে – একদমই হঠাৎ! বছর ষাটেক আগে মায়ের হাত ধরে প্রথম যেদিন তারকেশ্বর গেছিলাম, এতদিন পর তার সঠিক সন-তারিখ হারিয়ে গেলেও তারকনাথকে জড়িয়ে ধরার স্মৃতির সাথে দুধপুকুর কিন্তু অম্লান ছিল। সেই স্মৃতিটাকে আর একটু উজ্জ্বল করতেও বটে, আর গৃহিণীর তারকনাথ দর্শন হয়নি বলেও বটে, তারকেশ্বর যাবার চিন্তা মাথায় ঘুরছিল অনেকদিন ধরেই। শেষপর্যন্ত সেটা হঠাৎই হয়ে গেল – ঐ যে বললাম মার্চের ৪ঠা, মঙ্গলবার।

যাত্রীসাথী গোলমাল করলেও ভোর পাঁচটার আধো অন্ধকারে ট্যাক্সি পেতে অসুবিধা হয়নি, তবে সেটা ঘর থেকে নয় – মিনিট ছয়-সাতের হাঁটা পথ পেরিয়ে সিঁথির মোড় থেকে। হাওড়া স্টেশনের পুরানো কমপ্লেক্সের সামনে যে সময়ে পৌঁছেছিলাম তাতে ৫টা ৫৩-র ট্রেন অসম্ভব হলেও ৬টা ৩২-এর তারকেশ্বর লোকাল ধরতে পারা ছিল এক্কেবারে নিশ্চিত। টিকিটের লাইন ছিলো না বললেই চলে, তাই

ধীরেসুস্থে এসে দাঁড়াই ২ আর ৩ নম্বর প্লাটফর্মের কাছাকাছি। জানতাম তারকেশ্বর লাইনের ট্রেন ছাড়ে ঐ দুই প্লাটফর্মের কোনও একটা থেকেই।

হাওড়া-লিলুয়া-বেলুড়-বালি হয়ে শ্যাওড়াফুলি পর্যন্ত নতুন কিছু নয়, তারপরেই পথের পরিবর্তন। জংশন স্টেশন শ্যাওড়াফুলিতে দম নিয়ে দিয়াড়া-সিঙ্গুর-কামারকুণ্ডু হয়ে অবশেষে বড় স্টেশন হরিপাল। এই হরিপালে থাকা আমাদের পরিচিত শিপ্রা ম্যাডাম আর ফুল দা'র বিরাট ফুলের বাগানের কল্যাণে জানা ছিল তারকেশ্বর আর বেশী দূরে নয় – মাত্রই ১৪ কিলোমিটার। শেষ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের দৌড়। ৫৮ কিলোমিটার পথের শেষে পৌঁছে যাই লোকনাথের পরের স্টেশন তারকেশ্বরে। স্টেশন থেকেই শুরু হয়ে যায় পাণ্ডা ঠাকুরদের ডাকাডাকি। তবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাদের এই পীড়াপীড়িকে ঠিক জুলুমবাজি বলা যাবে না। কারণ কোন এক পাণ্ডার নাম বললেই তাকে আর কেউ টানাটানি করে না। আমার লেখক বন্ধু মন্টু মিত্র, যিনি প্রায়ই তারকেশ্বরে আসেন, তার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম 'শিবালয়'-এর পুরোহিত রবীন চট্টোপাধ্যায়ের নাম। সেই নাম বলতেই রাম নামে যেমন ভূত পালায় – উপমাটা ঠিক হল না, কারণ শিবালয়ের পথ বাতলে দিল তারাই। স্টেশনের বাইরেই টোটো স্ট্যান্ড। মাথাপিছু দশ টাকাতেই তারা পৌঁছে দিচ্ছে প্রায় মন্দিরের দরজায়। তবে পথ যখন বড়জোর ৪০০ মিটার আর সকাল আটটায় সূর্য যখন নিতান্তই ছেলেমানুষ, তখন পায়ে পায়ে শিবালয় পৌঁছাতে অসুবিধা কোথায়? শিবালয় আসলে ঠিক মন্দিরের গায়ে একটা দোকান। এরকম অনেক দোকানই রয়েছে মন্দিরের রাস্তার দু'ধারে। জুতো জামা ইত্যাদি তাদের কাছে জমা করে কত টাকার পুজো হবে জানালে ওরাই সঙ্গে পুরোহিত দিয়ে দেয়। রবীন পাণ্ডা সম্ভবতঃ সেদিন অসুস্থ ছিলেন। তাতে অবশ্য কোনও অসুবিধে হয় নি। পূজার ডালি সাজিয়ে ওরাই সঙ্গে লোক দিয়ে দিল যাতে যথাযথ ভাবে পূজা দিতে পারি। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, মেয়েদের পোষাকে কোনও বিধিনিষেধ না থাকলেও পুরুষদের ঊর্দ্ধাঙ্গ নিরাবরণ হতেই হবে।

DO NOT COPY

সাথের সাথী প্রথমেই নিয়ে আসে মন্দিরের উত্তরে দুধপুকুরে। এই সেই দুধপুকুর যেখানে প্রথম ডুব দিয়েছিলাম ছেলেবেলায় – মায়ের হাত ধরে। আজ সে দুধপুকুরের চেহারা অনেকটাই পাল্টে গেছে প্রধানত নিরাপত্তার কারণে। লক্ষ্মণের গণ্ডীর মতো রয়েছে তারকেশ্বর এস্টেটের প্রতিবন্ধক বেড়া – জলে ডুব দিতে হয় ঐ গণ্ডীর মধ্যে থেকেই। সে সব মিটে গেলে পুকুরের পাশের দোকান থেকে সংগ্রহ করে নিই দু'জনের জন্য দু'টো জলভর্তি ঘট – বাবার মাথায় ঢালার জন্য। তারপর মূল মন্দিরের পুরোহিতের কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়ে শিবালয়ের সঙ্গী ফিরে যায় অন্য কোনও ভক্তকে নিয়ে আসার জন্য। চৈত্র-বৈশাখ অথবা শ্রাবণ মাসের কোনও সোমবার নয়, নয় কোনও ছুটির দিনও। তাছাড়া শিবরাত্রির উৎসব শেষ হয়ে গেছে সপ্তাহ খানেক আগে। তাই জানতাম ভিড় তেমন হবে না। কিন্তু এমন করে বাবার দর্শন পাবো, পুরোহিতের সাথে একে একে দু'জনে এতক্ষণ ধরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারবো, সর্বোপরি জড়িয়ে ধরতে পারব আবরণে আচ্ছাদিত তারকনাথকে – এ আমার ভাবনার অতীত ছিল। স্মৃতিতে ভেসে এলো সুদূর অতীতের সন-তারিখ ভুলে যাওয়া সে দিনটা, যেদিন মায়ের কথায় জড়িয়ে ধরেছিলাম 'বাবার' শরীরের আবরণটাকে।

তারকনাথের মন্দির কিন্তু আজকের নয়। স্থানীয় কিংবদন্তী মতে হুগলী জেলার তারকেশ্বরের এক জঙ্গলের মধ্যে লিঙ্গরূপী তারকনাথ আবিষ্কৃত হন জনৈক মুকুন্দ ঘোষ দ্বারা। তারপর রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ভারমল্ল জঙ্গল কেটে এই মন্দির স্থাপন করেন ১৭২৯ সালে।

আজকের যে আটচালা মন্দিরে দেবতার পূজা হয়ে চলেছে তা তৈরি করেন শিয়াখালার গোবর্দ্ধন রক্ষিত। অনেক ভক্তেরই জিজ্ঞাসা তারকেশ্বরের শিব কোন জ্যোতির্লিঙ্গ কিনা। এর উত্তরে বলা যায় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বলে চিহ্নিত দেবস্থানের মধ্যে তারকেশ্বর না থাকলেও শিবপুরাণে যে ৬৪ জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ রয়েছে সেখানে স্বয়ম্ভু দেবতা তারকনাথের উল্লেখ অবশ্যই আছে। সেখানে তিনি পরিচিত

হয়েছেন তারকেশ্বর নাথ নামে। দেবতা এখানে শিবের এক রুদ্র রূপ যিনি সমুদ্র-মন্থনের সময় ত্রিলোক রক্ষার্থে 'কালকূট' পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। তারকেশ্বর নাথ আবার ভগবতী তারার স্বামীও বটে। সেই শিবলিঙ্গের মন্দির রয়েছে তারাপীঠের কয়েক কিলোমিটার দূরেই। কথিত আছে তারকনাথের প্রকৃত ভক্ত শুধু সুস্বাস্থ্য আর সুন্দর জীবনই লাভ করেনা, ভগবতী সেই ভক্তদের স্তন্যপান করান যাতে তারা মোক্ষলাভ করতে পারে। তারকেশ্বরের মন্দিরে শুধু তারকনাথ নয়, কাছেই রয়েছে লক্ষ্মী-নারায়ণ আর কালী মন্দির। ভোর চারটেয় মঙ্গলারতি হলেও দর্শন শুরু হয় সকাল ৬টা থেকে। দুপুরে ১:৩০ থেকে ৩.০০ পর্যন্ত দেবতার বিশ্রাম, তারপর তিনি আবার ভক্তদের দেখা দেন সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। তবে নিজেদের অভিজ্ঞতায় যা বুঝেছি সাত সকালে দেব দর্শনের সাথে ভালোভাবে পুজো দিতে পারলে লাগোয়া রাজবাড়িটি দেখে নেওয়ারও দিব্য সুযোগ হয়ে যায়। তারপর আমাদের ভ্রমণ কথা ফুরিয়ে গেলেও শীতকালের সকাল হলে আপনি চলতেই পারেন ৪৫ কিলোমিটার দূরের কামারপুকুর-জয়রামবাটি এমনকি সেখান থেকে ৪৬ কিলোমিটার দূরে বিষ্ণুপুরেও।

দুধ পুকুর

DO NOT COPY

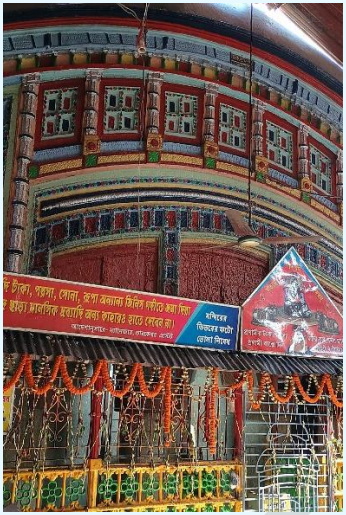

তারকেশ্বর মন্দিরের দ্বার

রাজবাড়ির প্রবেশ দ্বার

তারকেশ্বর স্টেশন

DO NOT COPY

প্রতিবাদ

সুনন্দন ঘোষ

সনাতনী রক্ত বইছে ধূলিয়ানে, সুতিতে, সামসেরগঞ্জে;
“কাফের” পর্যটকেরা গুলিতে ঝাঁঝরা হচ্ছে পহেলগামে।
জিহাদীর থাবা কাশ্মীর থেকে বাংলার মানচিত্রে।
ডিপ স্টেটের আশীর্বাদে আপ্লুত সেকুলারেরা
তত্ত্বের বাইট দিচ্ছে টিভির চ্যানেলে চ্যানেলে।

ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার আবর্তন কখনও নিদাঘে,
কখনও হিমে, কখনও বাদলে,
কখনও সন্দেশখালিতে, কখনও গোধরায়।
মন্দির জ্বলে, ইবাদতখানা ধ্বংস হয়ে যায়,
তবু দরজা বন্ধ করে থাকে আত্মমগ্ন শিক্ষিত সমাজ।

মৌলবাদের দেশ নেই, ধর্ম নেই, তৃষ্ণা আছে – রক্তের,
তৃষ্ণার যোগান দেয় ছা’-পোষা মানুষেরা।
আর্তনাদ থেমে এলে ছদ্ম-বিদ্বজ্জনেরা
মোমবাতি হাতে প্রতিবাদের নাটক পথস্থ করে।

এভাবেই পার হচ্ছি স্বাধীনতার অমৃত-কাল।
কতগুলো শতক কাটালাম ছিন্নমস্তা শিক্ষার পীড়নে!
এবার যুদ্ধে নামতে হবে হাতে হাত মিলিয়ে –
মৌলবাদের সঙ্গে জীবনবাদের, অশিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার,
অধর্মের সাথে ধর্মের।

DO NOT COPY